দুনিয়ার মজদুর এক হও

২১ দফার ভিত্তিতে
সামাজিক ন্যায্যতা-সমতা প্রতিষ্ঠাসহ
মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক
জনগণতান্ত্রিক আধুনিক
বাংলাদেশ গড়ে তোল

২১ দফা কর্মসূচি

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি

২১ দফা কর্মসূচি

প্রকাশকাল
২৬ অক্টোবর ২০১৭

প্রকাশক
বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি
৩১/এফ তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ
তাজ মোহাম্মদ
ভেকটর গ্রাফিকস এন্ড প্রিন্টিং
কাঁটাবন, ঢাকা

মূল্য : ১০ টাকা

সাধারণ সম্পাদকের কথা

পার্টির ভিতরে দীর্ঘদিন ধরেই সময়োপযোগী একটি আশু কর্মসূচির দাবি ছিল তা পূরণে পার্টির পক্ষ থেকে তিনজনের একটি ড্রাফট কমিটি করে দেওয়া হয়। কমিটির প্রস্তাবিত আশু ২১ দফা কর্মসূচি গত ৫, ৬, ৭ অক্টোবর ২০১৭ যথাক্রমে পলিটব্যুরো, কেন্দ্রীয় কমিটি ও বর্ধিত সভায় প্রাণবন্ত আলোচনা ও সংযোজন বিয়োজনের মধ্য দিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ২১ দফা কর্মসূচির উপর দাঁড়িয়ে নতুন উদ্যোগ নিয়ে আসুন পার্টিকে জনগণের মাঝে নিয়ে যাই। শ্রমিক-কৃষকসহ জনগণের নিজস্ব দাবির আন্দোলনের ভিত্তিতে বিকল্প শক্তি গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে সামাজিক-ন্যায্যতা-সমতা প্রতিষ্ঠাসহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক জনগণতান্ত্রিক আধুনিক বাংলাদেশ গড়ে তুলি। জয় আমাদের হবেই।

অভিনন্দনসহ

ফজলে হোসেন বাদশা
সাধারণ সম্পাদক
কেন্দ্রীয় কমিটি
বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি
২৫ অক্টোবর ২০১৭

ভূমিকা

১.১ বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি এ দেশের শ্রমিক-কৃষকের নিজস্ব দাবীভিত্তিক আন্দোলনসহ সকল গণতান্ত্রিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি। পার্টির রয়েছে কৃষকের তে-ভাগা আন্দোলন, ’৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ’৬২ এর আইয়ুব খানের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, ’৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান ও ’৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধসহ পরবর্তীকালের সকল প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক গণ-আন্দোলনের উত্তরাধিকার। ’৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ– পাকিস্তানি শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রায় দু’দশকের দীর্ঘ গণ-আন্দোলনের ফসল; এটি ছিল একটি জনযুদ্ধ, যেখানে রাজনৈতিক আন্দোলনে এবং সশস্ত্র প্রতিরোধে অংশগ্রহণ করেছে দেশের শ্রমিক-কৃষক-নারী-যুব-ছাত্র-জনতা সহ সকল স্তরের মুক্তিকামী মানুষ। ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহীদ হয়েছে, সম্ভ্রম হারিয়েছে দু’লক্ষ মা বোন। মুক্তিযুদ্ধে এই চরম আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই অর্জিত হয়েছে-মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। এই চেতনাকে সামনে রেখেই তখন রচিত হয়েছিল ’৭২ এর সংবিধান– যার মূলভিত্তি ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্র। এর মর্মবস্তুই হলো একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, বৈষম্যহীন সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা যার অভিমুখ হলো সমাজতন্ত্র; সেটিই ছিল আপামর জনগণের আকাঙ্ক্ষা। সংবিধান রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি নির্ধারণ করে, যাতে বঞ্চিত গণমানুষের নিরঙ্কুশ অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং বৈষম্যহীন ও সমতাভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থা সুনিশ্চিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ এদেশের জনগণের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এমন একটি মাইলফলক- যা নির্ধারণ করে দিয়েছে দেশের সকল রাজনৈতিক পদক্ষেপ হতে হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রেখেই। তাই, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রেখে জনগণের গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে।

১.২ মহান মুক্তিযুদ্ধের অর্জন ও জনগণের সংগ্রামের অন্তর্নিহিত এই মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার অগ্রযাত্রা সামনে এগুতে পারেনি। মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়া অন্যতম রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ শাসন ক্ষমতায় এসে মুক্তিযুদ্ধের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। শ্রেণীগত দুর্বলতার কারণে সমাজবিকাশের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পিত লক্ষ্যের অভাব, জনগণের ক্ষমতায়নের ত্রুটি, দলীয় সংকীর্ণতা, ভেঙ্গে পড়া অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে সফল না হওয়া,

ব্যাপক দুর্নীতি, পাশাপাশি জাতীয়-আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র শাসকগোষ্ঠীকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, যার সুযোগ গ্রহণ করে পিছনে থাকা মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তি, মুক্তিযুদ্ধে বিরোধীতাকারী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার এদেশীয় দোসররা। ১৯৭৫ সালে সামরিক ক্যু এর মাধ্যমে পরিবারের অধিকাংশ সদস্যসহ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়। রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে শুরু হয় ইতিহাসের উল্টোযাত্রা ও দক্ষিণপন্থী ধারা। খন্দকার মুশতাক ক্ষমতা দখল করে। কয়েক মাসের মধ্যেই অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জেনারেল জিয়া ক্ষমতায় আসে। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী জেনারেল জিয়াকে সামনে রেখেই তার নেতৃত্বেই শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা। মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীতাকারী জামাত, আলবদর-রাজাকার ও অন্যান্য ধর্মীয় লেবাসধারী রাজনৈতিক শক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এমনকি কিছু বামপন্থী গোষ্ঠীও এই পরিবর্তনের মর্মবস্তু বুঝতে অপারগ হয়ে, বিভ্রান্ত হয়ে জিয়ার হাতকে শক্তিশালী করে। জিয়াউর রহমান সামরিক শাসনের আড়ালে ধীরে ধীরে এদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি ভাবাদর্শের সকল শক্তিকে পুনর্জাগরিত ও ঐক্যবদ্ধ করে। স্বাধীনতার ৪৬ বছরে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী সামরিক-বেসামরিক শক্তি অধিকাংশ সময়ই যারা শাসকের ভূমিকায় থেকেছে তারা সামন্তাবশেষের ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ ধর্মান্ধ প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

১.৩ সামরিক ক্যু এর মাধ্যমে জেনারেল জিয়ার হত্যার মধ্য দিয়ে আসে আর এক সামরিক স্বৈরশাসক জেনারেল এরশাদ। স্বৈরাচারী এরশাদ সরকার তার ৯ বছরের শাসনামলে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সকল ক্ষেত্রকে নস্যাৎ করে দেয়। সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র থেকে শুরু করে সমাজের সকল স্তরে দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়। শিক্ষাব্যবস্থার সকল কাঠামোকে ধ্বংস করে ফেলা হয়। নির্বাচন প্রক্রিয়াকে প্রহসনে পরিণত করা হয়। সংবিধান সংশোধন করে '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম মূল চেতনা ধর্মনিপেক্ষতাকে বিসর্জন দিয়ে, ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার স্থায়ী বিষবৃক্ষ রোপণ করা হয়, যার জের আজও চলছে। এই সব সামরিক বেসামরিক শাসকেরা ক্রমাগতভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নিঃশেষিত করতে চেয়েছে। সমাজের অভ্যন্তরে রাজনীতি, অর্থনীতি,

সংস্কৃতিতে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির দাবীদার রাজনৈতিক দলসমূহ ব্যাপক কার্যকর কোন ঐক্য গড়ে তুলতে পারেনি। অনেক সময়ই কৌশলের নামে অপশক্তির সংগে আপোষ করেছে। বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি স্বাধীনতা পরবর্তী সময় হতেই অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের পক্ষে তার লড়াই অব্যাহত রেখেছে। ঐ লড়াইয়ে পার্টির বহু কর্মী বিভিন্ন পর্যায়ে শহীদ হয়েছেন। এমনকি ১৯৯২ সালে ১৭ আগস্ট ঐ অপশক্তির হাতে পার্টির সভাপতি গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসেন।

১.৪ রাজনীতির এই উত্থান-পতনের ধারায় ২০০১ সালে বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতায় আসে। প্রথমবারের মত '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধবিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের বিএনপি জোটবদ্ধ করে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় যাবার সুযোগ করে দেয়। এর ফলশ্রুতিতে, শাসন ক্ষমতার চার বছর চলে ধর্মীয় জঙ্গীবাদের অবাধ প্রশ্রয়ের যুগ। বাংলাভাইসহ বিভিন্ন ধারার জংগীবাদ রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। দেশকে তারা মধ্যযুগে ঠেলে নেবার পাঁয়তারা করে। সারাদেশে একযোগে বোমা হামলা, বিচারপতি ও আইনজীবী হত্যা, রমনা বটমূলে গ্রেনেড হামলা, সিনেমা হল জ্বালিয়ে দেয়া ইত্যাদির মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস কায়েম করে। পার্টি এই বিপদকে ধারাবাহিকভাবে জনগণের সামনে নিয়ে আসার রাজনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করে। ২০০৩ সালে মুক্তাঙ্গন থেকে বিএনপি-জামাত আর 'না' বলার মধ্য দিয়ে শুরু হয় ১৪ দলীয় জোট গড়ে তোলাসহ মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের ব্যাপকতম অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার রাজনৈতিক সংগ্রাম। প্রাসংগিকভাবে এটাও বলতে হয়, ১৪ দল গড়ে ওঠার আগে, অন্যান্য বাম ওগণতান্ত্রিক দল নিয়ে ১১ দলীয় জোটও গড়ে তোলা হয়। ২০০৪ সালে ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের জনসভায় গ্রেনেড হামলার ঘটনায় বাস্তবতার প্রয়োজনে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী সাম্প্রদায়িক জঙ্গিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে ব্যাপকতম ঐক্যের প্রয়োজন পড়ে এবং ঐক্যও গড়ে ওঠে; কিন্তু ঐক্যবদ্ধ অবস্থায় কিছুদিন চলার পর তখন কিছু কিছু বাম দল ব্যাপকতম ঐক্যের প্রয়োজনকে অস্বীকার করে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি-জামাত উভয়ের বিরুদ্ধে সমদূরত্বের রাজনীতি গ্রহণ করে। ফলে, সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী ব্যাপকতম ঐক্যের সুযোগ হাতছাড়া হয়। অনেক বাম বন্ধুরা জামাত-বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের মধ্যকার অসমাধানযোগ্য ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বকে বুঝতে না

পেরে সমদূরত্বের ভুল কৌশল গ্রহণ করে। ব্যাপক প্রগতিশীল শক্তির ঐক্য দুর্বল হয়। এর ফলে সৃষ্ট অবস্থায় আওয়ামী লীগের দোদুল্যমানতার সুযোগে স্বৈরাচারী এরশাদ মহাজোটে শরিক হয়, যাতে জোটের গণতান্ত্রিক চরিত্র জনগণের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ হয়। জামাত-বিএনপিও এতে রাজনৈতিকভাবে পরোক্ষ লাভবান হয়। তবুও পার্টি দৃঢ়তার সঙ্গেই সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যের অধিকতর কার্যকারিতার বিবেচনায় ১৪ দলকে এগিয়ে নেয় এবং পরবর্তিতে সামরিক সাহায্যপুষ্ট ফকরুদ্দিন-মঈন.ইউ আহমেদের সরকারের বিরুদ্ধেও সেই সংগ্রাম অব্যাহত রাখে। ১৪ দলীয় জোট ২০০৮ সালে সংসদ নির্বাচনে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় এবং সরকার গঠন করে। ১৪ দলীয় জোটের এই নির্বাচনী সাফল্য এদেশের অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক শক্তির মধ্যে সাহসের সঞ্চার করে। রাজনৈতিক কৌশলের দিক দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনরুদ্ধারের একধাপ অগ্রগতি হয়। ’৭২ এর সংবিধানের মূলনীতিমালা সংবিধানে সংযোজিত হয়। অসাম্প্রদায়িক শক্তির দুর্বলতা এবং জোট সরকারের প্রধান শরীক দলের আপোষমুখিনতার কারণে ‘রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম’ সংবিধানে থেকে যায়। চলমান সংবিধানে এটি একটি বড় দুর্বলতা ও ৪ মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক। এই সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দৃশ্যমান সাফল্য থাকলেও হলমার্ক, ডেসটিনি, শেয়ার মার্কেট কেলেংকারি, নিয়োগ বাণিজ্য, চাঁদাবাজি-সন্ত্রাস সাফল্যকে ম্লান করেছে। পার্টি এ সময় সরকারের সরাসরি অংশীদার না হলেও রাজনৈতিক সংগ্রামের অংশীদার ছিল। তবুও সরকারের ব্যর্থতার সমালোচনায় পিছপা হয়নি।

১.৫ ২০০৮ সালে ক্ষমতায় আসার পর মহাজোট সরকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু করে। এ ছিল একটি ঐতিহাসিক অঙ্গীকার। বিএনপি-জামাত বিভিন্ন কৌশলে প্রথম থেকেই এই বিচার বাধাগ্রস্ত করে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে প্রথম আসামী কাদের মোল্লার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হলে যুদ্ধাপরাধীদের সর্বোচ্চ সাজা ফাঁসীর দাবীতে গড়ে ওঠে শাহবাগভিত্তিক তরুণ প্রজন্মের ব্যাপক গণআন্দোলন যা দেশব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের নতুন চেতনা ও আবেগের পুনঃসঞ্চার করে। যুদ্ধাপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তি না দেওয়ার দোদুল্যমানতা বাধাগ্রস্ত হয়। সরকারও দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে। বিচার চলাকালীন সময়ে বিএনপি-জামাত সর্বোতভাবে বিচার বাধাগ্রস্ত করে। দেশ-বিদেশে কোটি কোটি টাকা খরচ, ঘুষ প্রদান, লবিষ্ট নিয়োগ, মার্কিন সিনেটরদের বিবৃতি কেনা, তুরস্কের আইনজীবীদের দিয়ে বিচার ট্রাইব্যুনালে বাধাপ্রদানসহ বহু

অপচেষ্টা চালায়। বিভিন্ন অঞ্চলে তারা যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসির বিরোধিতা করে রক্তক্ষয়ী প্রতিরোধও গড়ে তোলে। তবে তাদের এই অপচেষ্টা বিফল হয়। এই ধারাবাহিক বিরোধিতার এক পর্যায়ে ২০১৪ সালে নির্বাচনকালীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার ও গণতন্ত্রের দাবীতে তারা শুরু করে এক রক্তক্ষয়ী, সন্ত্রাসী আন্দোলন। তাদের ব্যবহৃত পেট্রোলবোমায় আহত ও নিহত হয় পুলিশসহ শত শত সাধারণ নাগরিক। পার্টি প্রথম থেকেই বিএনপি-জামাত-হেফাজত ও আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী ও তাদেরই সৃষ্ট জংগীবাদী ষড়যন্ত্র সম্পর্কে দেশবাসীকে বারবার সতর্ক করে। পার্টি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ধারার রাজনীতিকে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সর্বদলীয় সরকারে অংশগ্রহণ করে ও ৫ জানুয়ারীর নির্বাচনের পরও সরকারে আছে। এই সরকারের অনেক সমালোচনা রয়েছে। তা সত্ত্বেও ঐতিহাসিক সত্য যে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্ভব হয়েছে এই সরকারের সময়েই। এটা আমাদের রাজনৈতিক সংগ্রামের একটি বড় অর্জন।

১.৬ পার্টির কর্মসূচি নির্ধারণের জন্য দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কের বিচার একটি মৌলিক বিষয়। বিগত চার দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সার্বিক গুণগত পরিবর্তন না হলেও পরিমাণগত পরিবর্তন হয়েছে। অর্থনীতির আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের গড় জাতীয় বার্ষিক উৎপাদন (GDP) (২০১৭) ২৪৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং গড় জাতীয় বার্ষিক আয় (২০১৭) ৬৮৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। জিডিপির ১৮.৭% আসে কৃষি থেকে, ২৮.৭% আসে শিল্প থেকে এবং ৫২.৬% আসে পরিষেবা থেকে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রধান ক্ষেত্র এখনও কৃষিতেই রয়েছে। শ্রমশক্তির প্রায় ৬২.৫ শতাংশ এখনওকৃষি অর্থনীতিতে জড়িত। প্রথমত শিল্পক্ষেত্র বিবে না করা যাক। দেশে শিল্পক্ষেত্রে প্রায় বিশেরও অধিক সেক্টর রয়েছে। তারমধ্যে দৃশ্যত প্রধান হলো তৈরী পোষাক শিল্প বা গার্মেন্টস সেক্টর। যা তুলনায় পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম (চীনের পর)। এই সেক্টরে প্রায় ৫০০০ হাজার কারখানা রয়েছে, যেখানে প্রায় ৫০ লক্ষ শ্রমিক কাজ করে যার ৮০ শতাংশ নারী শ্রমিক। এ ছাড়া প্রধান শিল্পগুলোর মধ্যে আছে পাট, বস্ত্র, ফার্মাসিউটিক্যাল, সিমেন্ট,সার, চামড়া প্রভৃতি। প্রায় তিন দশকের বেশী সময় ধরে বিরাষ্ট্রীয়করণ প্রক্রিয়া ও নয়াউদারনৈতিক বাজার অর্থনীতিকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করায় রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প ধীরে ধীরে রুগ্নপ্রায় হয়ে যাচ্ছে। দেশের শিল্পায়ন চিরায়ত বিকাশ ধারায় যেতে পারছে না।

মূলভরকেন্দ্র ধীরে ধীরে ব্যক্তিমালিকানার দিকে সরে এসেছে। তদুপরি বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এখন দেশে প্রায় ৩৪টির বেশী বহুজাতিক কোম্পানি (মোবাইল টেলিকমসহ) রয়েছে। তাদের পুঁজির পরিমাণ দেশীয় পুঁজির চেয়ে বেশী, মুনাফাও বেশী। এ ছাড়া রয়েছে সাম্রাজ্যবাদের ফিনান্স পুঁজি ওতার বাজারের চাপ। বাংলাদেশের শিল্পায়ন ও বিনিয়োগের হিসেবে দেশে বিনিয়োগপ্রবণ পুঁজি বাড়ছে, যদিও তা জাতীয় পুঁজিতে বিকশিত হতে পারছে না। এ ছাড়া রয়েছে রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা কালোটাকার অবিনিয়োগযোগ্য ফাটকাপুঁজি, যার অধিকাংশই বিদেশে পাচার হচ্ছে 'মানি লন্ডারিং' এর মাধ্যমে। গত দশবছরে বাংলাদেশ থেকে ৭ হাজার ৫৮৫ কোটি ডলার বিদেশে পাচার হয়। আমাদের দেশে অর্থমন্ত্রী যখন সংসদে স্বীকার করেন প্রতি বছর বাজেটের সমান অর্থ পাচার হচ্ছে, তখন এটা স্পষ্ট যে লুটেরা পুঁজিবাদ দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করছে এবং জনগণকে বঞ্চিত করছে। তাই আমাদের উপলব্ধি করতে হবে নয়া উদারনৈতিক পুঁজিবাদ আমাদের উন্নয়নের পথ হতে পারে না। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ দৃষ্টিভঙ্গি আমরা গ্রহণ করি নাই। আমাদের সংবিধান এর সাক্ষ্য দেয়। এ টাকা দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে ক্ষমতা ও প্রাধান্য বিস্তারের প্রধান সহায়ক। বিদ্যমান রাষ্ট্রও এর সহায়ক ও স্বার্থ রক্ষক হিসেবে কাজ করছে। এদেরকে 'দুর্বৃত্ত পুঁজিবাদী' বা rent seeker বলা চলে। এরা শিল্পপুঁজি বিকাশের বড় অন্তরায়। জাতীয় পুঁজি বিকাশের জন্য এর বিরুদ্ধে সংগ্রামও জাতীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতির অন্যতম কাজ। দ্বিতীয়ত আলোচনার বিষয়টি কৃষিক্ষেত্র। আগেই বলা হয়েছে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি এখনও প্রধান ক্ষেত্র। বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতিতে এক নীরব বিপ্লব সাধন করেছে এদেশের কৃষকেরা এবং দেশের কৃষিবিজ্ঞানীরা। নতুন প্রজাতির বীজ, সার, সেচ ও অন্যান্য প্রযুক্তিগত প্রয়োগ বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে প্রভূতভাবে। এখন বাংলাদেশে চাল উৎপাদন ক্ষমতা বছরে প্রায় তিন কোটি ৫০ লক্ষ টনের কাছাকাছি। চাল ছাড়াও সবজি, ফল, মৎস্য সম্পদ, প্রাণি সম্পদ, হাঁস-মুরগী উৎপাদনের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। উৎপাদন ক্ষমতার এই বিপুল বৃদ্ধি গ্রামীণ অর্থনীতিতে কিছুটা সাশ্রয় ও গতির সঞ্চার করলেও বৈষম্যের হেরফের হয়েছে সামান্যই। বাংলাদেশে জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হলেও ভূমি সংস্কার হয়নি। চাষযোগ্য জমি প্রকৃত কৃষকের হাত

থেকে হস্তান্তর হয়ে যাচ্ছে। তার একটা অংশ যেমন জোতদার বা ধনী কৃষকদের হাতে, অন্য অংশ যাচ্ছে শহুরে ধনিক শ্রেণীর হাতে। তার কিছুটা হয়ত শিল্পোদ্যোগে ব্যবহৃত হচ্ছে, কিন্তু বেশিরভাগই অনুৎপাদনশীল এবং অকৃষিখাতে চলে যাচ্ছে। বিভিন্ন চর এলাকায় লক্ষ লক্ষ একর জমি রয়েছে যা মূলত ভূমিদস্যুদের হাতে। কৃষিজমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। এর উপর রয়েছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্রমবর্ধমান চাপ। ব্যাংকের কাছ থেকে প্রয়োজনে কৃষকের হাতে এখনও ঠিক সময়ে ঋণ পৌঁছে না, যার ফলে রয়ে গেছে গ্রামীণ মহাজনী প্রথা, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নব্য মহাজনী এনজিও ঋণ ব্যবস্থা। উৎপাদনক্ষেত্রে এখনও রয়েছে ছোট ছোট খণ্ডিত জোত। এ সবই এখনও চরিত্রগতভাবে সামন্তাবশেষের চিহ্ন। তৃতীয়তঃ যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বা দেশের অর্থনীতিকে মৌলিকভাবে সহায়তা দিচ্ছে তাহলো বিদেশে কর্মরত প্রায় এক কোটি মানুষের পাঠানো ‘রেমিট্যান্স’। এই অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি করছে, যার পরিমাণ এখন (২০১৭) প্রায় ৩২.১৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর কিছু অংশ গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রবেশ করছে, যা কিছু কিছু ক্ষেত্রে গ্রামীণ অর্থনীতির বিবর্তনে ভূমিকা রাখছে। তবে তা এখনও দৃশ্যমান পরিকল্পিত উৎপাদনখাতে বিনিয়োগ হচ্ছে না।

এছাড়া দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যাংক পদ্ধতির বিস্তৃতি হয়েছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানা লাভজনক নয় এই অজুহাতে ব্যক্তিমালিকানায় ব্যাংকের সংখ্যা প্রায় তিরিশ। কিন্তু, অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি, জালিয়াতি প্রভৃতি দুর্বৃত্তপনা এই ক্ষেত্রকে লুটেরার রাজত্বে পরিণত করেছে। যেন ব্যাংক তৈরি হয়েছে অসদুপায়ে পুঁজি অর্জনের জন্য। অলস ফাটকা পুঁজি অনুৎপাদনশীল খাতে যাচ্ছে অথবা ঋণখেলাপীদের সম্পদ বৃদ্ধি করছে। বিদেশে টাকা পাচার করে তারা সেকেন্ড হোম গড়ে তুলছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে স্পষ্টতঃই তিনটি বিষয় প্রতীয়মান হয়, (ক) বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ধীরে হলেও পুঁজির বিকাশ হচ্ছে, যদিও তা স্বাধীন জাতীয় পুঁজি বিকাশের স্তরে পৌঁছাতে পারেনি। পাশাপাশি এক ধরণের অবিনিয়োগযোগ্য দুর্বৃত্ত পুঁজি জন্ম নিয়েছে। (খ) সাম্রাজ্যবাদের ফিন্যান্স পুঁজির প্রভাব দেশের অর্থনীতিতে প্রবল এবং তা দেশীয় স্বাধীন পুঁজি বিকাশের ক্ষেত্রে বাধা। নয়াউদারনৈতিক সাম্রাজ্যবাদী বাজার অর্থনীতি প্রতি মুহূর্তে প্রবল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাপ অব্যাহত রাখছে। (গ) দেশের

কৃষিতে উৎপাদন শক্তির দৃশ্যমান উন্নতি সত্ত্বেও সামন্তাবশেষের যে সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে তার মুখ্য দিক হলো ক্ষুদ্র ওগ্রামীণ ব্যবস্থা, এশীয় চরিত্রের ধারাবাহিকতা এখনও বিদ্যমান যা কৃষিতে পুঁজিবাদী বৃহৎ উৎপাদনের ও আরো উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির পথে অন্তরায়। দেশের আর্থ-সামাজিক এই বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাই দেশের রাজনৈতিক উপরি কাঠামোতে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়ন ও লুটপাটের ধারা বর্তমান তাই বিস্তৃত রাজনীতি ক্ষেত্রেও। দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়ন-সাম্প্রদায়িকতা রাজনীতির প্রধান ধারায় পরিণত হয়েছে। নির্বাচন পরিণত হয়েছে টাকার খেলায়। জাতীয় সংসদ ওস্থানীয় সরকারগুলো এর থেকে মুক্ত নয়। মুক্ত নয় দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো। এ কারণে নতুন প্রজন্ম এক স্বপ্নহীন অবস্থায় রয়েছে। এর থেকে মুক্তি পেতে মানুষ বিকল্পের সন্ধান করছে। তাই আজ সাম্রাজ্যবাদ, পশ্চিমা দুনিয়ার নয়া উদারীকরণ নীতির সমর্থক লুটেরা বুর্জোয়া শাসক গোষ্ঠীর দলসমূহ ও তাদের এদেশের স্বাভাবিক মিত্র মুক্তিযুদ্ধবিরোধী সাম্প্রদায়িক দক্ষিণপন্থী শক্তির বিরুদ্ধে সকল গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক শক্তির ব্যাপক সমাবেশ, সকল বাম-প্রগতিশীল শক্তিগুলোর মধ্যে ঐক্য ও সমঝোতা ও শ্রমিক-কৃষকের নিজস্ব লড়াই এর ভিত্তিকে বাড়িয়ে তুলে, জনগণের ধারাবাহিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই বিকল্পের জনভিত্তি গড়ে তুলতে হবে।

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি জনগণের সংগ্রামী নেতৃত্ব হিসেবে দেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সেই বিকল্পই তুলে ধরছে দেশবাসীর কাছে। ওয়ার্কার্স পার্টি সামাজিক ন্যায্যতা-সমতা প্রতিষ্ঠাসহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক জনগণতান্ত্রিক আধুনিক বাংলাদেশ গড়ে তুলে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যাভিমুখে এগিয়ে যাবে। সেই লক্ষ্যে ওয়ার্কার্স পার্টি আন্দোলন ও নির্বাচন উভয় সংগ্রামের লক্ষ্য হিসেবে নিম্নোক্ত আশু কর্মসূচি ঘোষণা করছে–

২১ দফা আশু কর্মসূচি

১। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ

১.১। প্রতি নাগরিকের মানসম্পন্ন এবং প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। খাবারের অধিকার প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা ওখাদ্য অধিকার আইন নিশ্চিত করতে হবে। গ্রাম-শহরের দিনমজুর, খেতমজুর ও নিঃস্ব দরিদ্র জনগোষ্ঠীসহ নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের জন্য গণবণ্টন অর্থাৎ রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

১.২। গণউদ্যোগ ও জনপরিকল্পনার ভিত্তিতে দেশীয় ঐতিহ্য ও লাগসই প্রযুক্তি অনুসরণ করে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করাসহ চাল ডাল তেলসহ দ্রব্যমূল্য জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখতে হবে। 'মূল্য নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ' প্রতিষ্ঠা করে বাজার তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণ, ভেজাল খাদ্য প্রস্তুত, সরবরাহ ও বিপণন বন্ধ করে নিরাপদ খাবার তৈরি ও বিপণন নিশ্চিত করা। ভোক্তা অধিকার আইন প্রণয়ন করে ভোক্তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি নিষ্কাশনসহ সকল প্রকার সেবার মূল্য সাধারণ মানুষের সঙ্গতির মধ্যে ওস্থিতিশীল রাখতে হবে।

১.৩। বাজার-সিন্ডিকেট অপরাধ চক্র সমূলে উৎপাটন ও মজুদদারি কঠোরভাবে দমন করতে হবে।

২। কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করা

২.১। কর্মক্ষম সব মানুষের জন্য ক্রমান্বয়ে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ করতে হবে। প্রাথমিকভাবে দেশের সবচেয়ে দরিদ্র ১০০ উপজেলায় খরা, বন্যা, জলাবদ্ধতা ও প্রকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহ চিহ্নিত করে 'কর্মসংস্থান স্কীম' চালু এবং পর্যায়ক্রমে তা সম্প্রসারিত করা, প্রতি বছর ন্যূনতম ১০% নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২.২। দরিদ্র জনগণের জন্য বসত ভিটা ও খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা সেবাসহ ন্যূনতম বেঁচে থাকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

২.৩। শহর ও গ্রামের মধ্যে সুযোগ-সুবিধার বিদ্যমান বৈষম্য ক্রমান্বয়ে দূর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা, সকল নাগরিকের সুযোগের সমতা আনা,

গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, কাজের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করে গ্রামের মানুষের শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা বন্ধ করতে হবে।

২.৪। উপযুক্ত পুনর্বাসন ছাড়া বস্তি ও হকার উচ্ছেদ বন্ধ করা, দরিদ্র নিম্নবিত্তদের জন্য গৃহনির্মাণ ঋণ প্রকল্প চালু করা, বস্তিবাসীর জন্য পৌর জীবনের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা, শহরের খাস জমি উদ্ধার করে সেখানে সরকারিভাবে কলোনি, ডরমিটরি ইত্যাদি নির্মাণ করে তা গরীব শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে ও বস্তিবাসীদের কাছে বসবাসের জন্য বরাদ্দ দিতে হবে। বাস্তুহীন ও নিম্নবিত্ত দরিদ্র সকল পরিবারের জন্য ৩ বছরের মধ্যে ন্যূনতম বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। কৃষক, খেতমজুর ও কৃষি সংস্কার ভূমিনীতি প্রসঙ্গে

৩.১.১। খোদ কৃষকের হাতে জমি এই নীতিমালার ভিত্তিতে ভূমি সংস্কার করতে হবে।

৩.১.২। পরিবারের সংজ্ঞা পুনঃনির্ধারণ করেই জমির সিলিং ব্যবস্থার পুনঃসংস্কার করা, এক ফসল জমির ক্ষেত্রে জমির সিলিং ৫০ বিঘা এবং দো ফসলা জমির সিলিং ৩০ বিঘা নির্ধারণ করা সহ অকৃষক জমির মালিক, যাদের পরিবার কৃষি আয়ের ওপর নির্ভরশীল নয়, তাদের জমি অধিগ্রহণ করা এবং উদ্ধারকৃত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে।

৩.১.৩। বর্গা রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা, বর্গা চাষীদের বর্গাসত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা। বর্গা চাষীদের জমি থেকে উচ্ছেদ নিষিদ্ধ করা ও উৎপাদিত ফসলের ক্ষেত্রে তেভাগা কার্যকর করতে হবে।

৩.১.৪। খাস জমি ও জলাশয় উদ্ধার করে ভূমিহীন কৃষক জনগণের মধ্যে বিলিবণ্টনের উদ্যোগ গ্রহণ করে, জলমহলগুলো প্রকৃত মৎস্যজীবীদের হাতে দিতে হবে।

৩.১.৫। শিল্প বাণিজ্য, রাবার বাগান করার নামে নামসর্বস্ব শিল্প মালিক, ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের জমির লীজ বা ক্রয়ের অনুমোদন বাতিল করে কৃষি জমি রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। আবাদী কৃষি জমিতে ইটের ভাটা রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীদের আবাসিক প্রকল্প গড়ে তোলা আইন করে নিষিদ্ধ করতে হবে।

৩.১.৬। অল্প জমিতে অধিক আয়ের সংস্থান গড়ে তুলতে হবে। কৃষিকে ভিত্তি করে 'ফসল উৎপাদন ম্যাপিং' ও অঞ্চল ভিত্তিতে এ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রি কমপ্লেক্স গড়ে তুলতে হবে।

৩.১.৭। খেতমজুর, দিনমজুরদের সারা বছরের কাজের নিশ্চয়তা প্রদান করা, বাজার মূল্যের সাথে সঙ্গতি রেখে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করতে হবে। ১০০ দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্প মঙ্গা, খরা, জলাবদ্ধ এলাকা ভিত্তি হিসেবে ধরে সারাদেশে তা সম্প্রসারিত করা, অর্ধ দিনের মজুরি ১০০ টাকার পরিবর্তে ২৫০ টাকা ধার্য করা এবং ১০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি কার্ড প্রদান করা, বয়স্ক ভাতা ও দুঃস্থ ভাতার টাকা দ্বিগুণ করতে হবে।

৩.২। কৃষি নীতি

৩.২.১। বাংলাদেশে কৃষি নীতি বলতে কৃষি উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত নীতিমালার আইনগত দিক, উৎপাদনে নীতিমালার দিক, উপকরণের দিক, উৎপাদিত ফসলের বাজারজাতকরণ, লাভজনক মূল্য, সামগ্রিক দিকগুলো নিয়ে আমাদের দেশে কোন নীতিমালা নেই। যা আছে তাও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ সমস্ত দিকগুলোকে সামনে রেখে কৃষি নীতি নির্ধারণ করতে হবে।

৩.২.২। আধুনিক কৃষি নির্ভর উন্নতমানের বীজ, সার, কীটনাশক সেচসহ অন্যান্য কৃষি উপকরণ, কৃষি উপকরণের ভর্তুকী বাড়ানো, উপকরণ বিতরণ ও বাজারজাতকরণ ঢালাওভাবে ব্যক্তি মালিকানায় না দিয়ে বিএডিসিকে সচল করে তার নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে।

৩.২.৩। উৎপাদন ব্যয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ধান, পাট, আখ, তামাক, পানসহ প্রধান ফসলগুলোর লাভজনক মূল্য পাবার ব্যবস্থা ও মধ্যসত্ত্বভোগীদের হাত থেকে কৃষি পণ্য সরাসরি ভোক্তার হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থাসহ বাজারজাতকরণের সমস্যাসমূহ দূর করতে হবে।

৩.২.৪। গ্রামাঞ্চলে মহাজনী ঋণের ও এনজিও ঋণের খপ্পর থেকে কৃষি ও কৃষককে রক্ষা করার জন্য বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ, কৃষি ব্যাংকসহ তফসিলি ব্যাংকের কৃষি ঋণের সরল সুদ ৫%, সেই সঙ্গে এনজিওদের ঋণের সুদ অনুরূপ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা। ক্ষুদ্র কৃষকদের ফসল অনুযায়ী বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ দেয়া সহ মৌসুমী ঋণ ব্যবস্থা চালু

করতে হবে।

৩.২.৫। দেশীয় বীজ ভাণ্ডারকে রক্ষা, দেশীয় উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনের বীজ উদ্ভাবন, বন্ধ্যা বীজ ও জিএমও বীজ বাদ দিয়ে আমাদের দেশের বিজ্ঞান প্রযুক্তিকে ব্যবহার, কৃষি গবেষণাকে আরও বেশি করে গুরুত্ব দিতে হবে। বীজ ব্যাংক গড়ে তুলতে হবে।

৩.২.৬। শস্য বীমা চালু করা, খরা, বন্যা, জলাবদ্ধতাসহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কৃষিখাতকে রক্ষা করার বিজ্ঞান ভিত্তিক বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৩.২.৭। হাট-বাজার, ঘাট, বিল-বাওড়, হাওড়সহ ইজারাদারি ও কন্ট্রাক্ট প্রথা বাতিল করা সহ হাট-বাজারে সরাসরি কৃষকদের বেচাকেনার ওপর তোলা বা খাজনা বন্ধ করতে হবে।

৩.২.৮। কৃষি উৎপাদন স্বার্থবিরোধী বিভিন্ন প্রতারণা, অপরাধ, দুর্নীতি দমনে কৃষি আদালত গঠন করতে হবে।

৩.২.৯। অতি জনসংখ্যার এই দেশে খাদ্য নিরাপত্তা, শিল্প, আবাসন ইত্যাদি দিকগুলোকে খেয়ালে নিয়ে কৃষি-অকৃষি জমি চিহ্নিত করে কৃষকের প্রতিনিধি, ভূমি সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও গবেষকসহ সকলের মতামত নিয়ে ভূমি ব্যবহার নীতিমালা সংশোধন ও তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা সহ চাষযোগ্য কৃষি জমি অকৃষি কাজে ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

৪। শিল্প, শ্রমিক-কর্মচারি ও মালিকানা

৪.১। মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে বিরাষ্ট্রীয়করণ, বিনিয়ন্ত্রণ, উদারীকরণের আত্মঘাতী নীতি পরিত্যাগ করে রাষ্ট্রীয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে দক্ষ, উন্নত ও লাভজনক করার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। নতুন করে কোন কারখানা বিরাষ্ট্রীয়করণ করা যাবে না।

৪.২। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩ (ক) (খ) (গ) অনুসারে উৎপাদন যন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বণ্টন প্রণালীতে রাষ্ট্রীয় মালিকানা অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র দ্বারা গঠিত হবে। যা জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা

হিসেবে বিবেচিত হবে। মালিকানার এই নীতির ভিত্তিতে দেশের আর্থ সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

৪.৩।বন্ধ করে দেওয়া পাটকল, বস্ত্রকল, চিনিকলসহ সকল বন্ধ কারখানা চালু করা, চাকুরিচ্যুত শ্রমিক-কর্মচারিদের কাজ ও চাকুরিতে পুনর্বহাল করা সহ পাট শিল্পে বিকাশের জন্য আন্তর্জাতিক বাজার দখল ও বাস্তবসম্মত কার্যকরী বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪.৪। ব্যাংক, বীমা, টিএন্ডটি, বিদ্যুৎ মৌল ও ভারী শিল্পকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় রেখে জাতীয় চাহিদা অনুযায়ী সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে ব্যাপক ছোট, মাঝারি ও ভারি শিল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং সকল গার্মেন্টস শিল্পকে একই জাতীয় শিল্প নীতিমালার অধীনে আনতে হবে।

৪.৫।২০০৬ সালে প্রণীত শ্রম আইন ২০১৩ (সংশোধিত) শ্রম আইন এবং ২০15 সালে প্রণীত শ্রম বিধিতে শ্রমিক স্বার্থবিরোধী ধারাসমূহ এবং আইএলও কনভেনশন পরিপন্থী সংশোধনী সমূহ বাতিল করে গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রণয়ন করে, বাংলাদেশে আইএলও কনভেনশনের গৃহীত সকল অনুচ্ছেসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে।

৪.৬।শ্রমিকদের (ইপিজেড এলাকা, বিশেষ অর্থনৈতিক জোনসহ) পরিপূর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও ধর্মঘটের অধিকার নিশ্চিত করা, আদালতে সুনির্দিষ্ট অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কোন শ্রমিককে বরখাস্ত করা নিষিদ্ধ করতে হবে। নতুন শিল্প কলকারখানা প্রতিষ্ঠার পূর্ব শর্তসমূহ পূরণ করে শ্রমিকদের জীবনমানের জায়গাটি নিশ্চিত করতে হবে।

৪.৭।গার্মেন্টসসহ সকল মিল কারখানায় ৮ ঘণ্টা শ্রম দিবস চালু এবং ওভারটাইম আইন অনুযায়ী দ্বিগুণ মজুরি প্রদানের জন্য মালিক বা কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করা, বিনা মজুরিতে জোর করে ওভারটাইম করালে মালিককে কঠোর শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা, কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ ও শ্রমিকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৪.৮। বর্তমান বাজার দরের সাথে সঙ্গতি রেখে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ১০ হাজার টাকা ধরে নতুন বেতন ও মজুরি নির্ধারণ করে, মূল্যস্ফীতির সাথে

সামঞ্জস্যপূর্ণ বেতন বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হবে।

৪.৯। সকল পর্যায়ে নারী শ্রমিকদের মাতৃকালীন ছুটি, ভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। সরকারি-বেসরকারি মাতৃত্বকালীন ছুটির বৈষম্য রদ করতে হবে।

৪.১০। প্রবাসী শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিশেষ সেল প্রতিষ্ঠা করা, ইমারত নির্মাণ শ্রমিকদের সুরক্ষা আইনসহ শ্রম আইন বাস্তবায়ন করা, নির্মাণ শ্রমিক, চা বাগানের শ্রমিক, গৃহশ্রমিক প্রভৃতি শ্রমজীবী মানুষের সমস্যা নিরসন করতে হবে।

৪.১১। বাংলাদেশের ঐতিহ্য তাঁত শিল্পকে আধুনিক বাজার ব্যবস্থার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নিয়ে আসা, তাঁত শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন, মজুরি নিশ্চিতসহ তাঁতের সকল উপকরণে ভর্তুকি দিতে হবে। সরকারি ব্যবস্থাপনায় সহজ শর্তে ঋণ দিতে হবে।

৫। বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থাপনা এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি

৫.১। জীবনমানের উন্নয়ন ও উৎপাদন ব্যবস্থার অগ্রগতিতে বিদ্যুতের কোন বিকল্প নেই। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সমস্যা মোকাবেলায় একটি স্বচ্ছ জবাবদিহিতাপূর্ণ আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে। কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ উৎপাদন পদ্ধতি বাতিল করতে হবে।

৫.২। বাংলাদেশ-ভারত-ভুটান-নেপাল সহ এই অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তোলাসহ গ্যাস খাতে রাষ্ট্রীয় পরিপূর্ণ বিনিয়োগ সহ বাংলাদেশী গ্যাস
কোম্পানি বাপেক্সকে আধুনিক প্রযুক্তিসহ আন্তর্জাতিকমানের দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা এবং বাংলাদেশ গ্যাস ক্ষেত্রকে তাদের হাতে দিয়ে গ্যাসের মাধ্যমে বিদ্যুৎ প্রযুক্তির আরও আধুনিকায়ন করতে হবে।

৫.৩। বিদ্যুতের মূল্য না বাড়িয়ে বিদ্যুৎ খাতের দুর্নীতি রোধ করা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি ক্রয়ের স্বচ্ছতা ও পরিকল্পনা নিশ্চিত করতে হবে।

৬। সড়ক, রেল, বিমান, নৌ পরিবহনসহ আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা ও ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন

৬.১। জনবহুল এই দেশে অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, জনসম্পৃক্তি সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করণে সড়ক জনপথের ব্যাপক মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখা। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আন্তঃ জেলা মহাসড়কগুলিকে ৪ লেনে উন্নীতকরণ সহ নতুন নতুন ফিডার সড়ক তৈরি করে দেশের সকল বন্দরের সঙ্গে সড়ক ও নৌ যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

৬.২। জরুরি ভিত্তিতে গণপরিবহন খাত উন্নয়নে রেলের কার্যক্রমকে সম্প্রসারণ করা, নতুন নতুন রেলপথ বসাতে হবে। পুরাতন আন্তজেলা রেল লাইনকে ডাবল ট্রাক সহ বিদ্যুৎ নির্ভর ট্রেন লাইনে রূপান্তর করতে হবে। আন্ত মহাদেশীয় রেল সংযোগের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে। এই মুহূর্তে চলমান রেল ব্যবস্থায় প্রতিটি রুটে ট্রেনের সংখ্যা বাড়াতে হবে। প্রতিটি মহানগরীকে ঘিরে সার্কুলারে রেলওয়ে, সাবওয়ে মেট্রোরেলের কাজ শুরু করার পরিকল্পনা গ্রহন করতে হবে।

৬.৩। নদীমাতৃক বাংলাদেশে নৌ পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়নের উদ্যোগ আরও বাড়িয়ে গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলির নাব্যতা বৃদ্ধি করে নৌ যাত্রী সেবা ওনৌ পথে পরিবহনের মাত্রা বাড়িয়ে সড়কের চাপ কমাতে হবে। নদী খননের জন্য দক্ষ জনবল সহ আন্তর্জাতিকমানের ড্রেজিং ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে। নদী ড্রেজিং এ দুর্নীতি অপচয় বন্ধ করতে হবে।

৬.৪। জাতীয় পরিচয় বহনকারী 'বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স' যুগপোযোগি করতে আধুনিক ব্যবস্থাপনা সহ দক্ষ জনবল, সক্ষমতা অর্জন, আন্তর্জাতিক বাজারে টিকে থাকার সামর্থ এবং নতুন ক্রাফট প্রতিনিয়ত পরিবহনে যুক্ত করতে হবে। অপচয় দুর্নীতি পরিপূর্ণভাবে উচ্ছেদ করতে হবে। আগামী পঞ্চাশ বছরের পরিকল্পনা অধীন করে দেশের প্রতিটি বিভাগে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর সহ বাংলাদেশের বিশেষ বিশেষ জেলায় বিমান বন্দর নির্মান করতে হবে। অভ্যন্তরীণ বিমান ব্যবস্থাপনাকে আরও দক্ষ-যোগ্য করে সাশ্রয়ী করে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে। বেসরকারি

বিমান খাতকে প্রনোদনা দিতে হবে।

৭। সুষম উন্নয়নে নগরায়ন ও গ্রাম উন্নয়ন, জলাবদ্ধতা নিরসন, পয়ঃপ্রণালীর উন্নয়ন ও সুপেয় পানির ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।

৭.১। বিশ্ব পুঁজিবাদি ব্যবস্থার প্রান্তিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশও আয় বৈষম্য ধন বৈষম্যের শিকার। বুর্জোয়া লুটেরা শাসকগোষ্ঠী তাদের স্বার্থে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করে ফলশ্রুতিতে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাও শহর-গ্রামের পার্থক্য রচনা করেছে। অপরিকল্পিত নগরায়ন ও গ্রাম উন্নয়নের পশ্চাৎপদতার কারণে শহরে অভিবাসির সংখ্যা বাড়ছে। এই ধারা বন্ধ করতে হবে। সেই লক্ষ্যে সুষম উন্নয়নের সুদূরপ্রসারি জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। উন্নয়নের বিকেন্দ্রীয়করণ এবং উৎপাদন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীয়করণের লক্ষ্যে শ্রমঘন শিল্প, কৃষি শিল্প, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাট উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবাসহ প্রতিটি সেবা খাতে শহর গ্রামে বণ্টন থাকতে হবে।

৭.২। অপরিকল্পিত নগর ও গ্রাম উন্নয়নে জলাবদ্ধতা প্রকট সংকট সৃষ্টি করছে; আধুনিক পয়ঃপ্রণালীর টেকসই ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে। দেশব্যাপী আর্সেনিকমুক্ত সুপেয় পানির ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

৭.৩। সকল নগর-মহানগরগুলোতে দরিদ্র, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত জনগণের আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বাড়ীভাড়া ও ভাড়াটিয়ার স্বার্থের আইন কার্যকর করতে হবে।

৮। আদিবাসী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ

৮.১। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর পরিধি বাড়াতে হবে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে প্রদত্ত সুবিধাসমূহ আইন দ্বারা অধিকারে পরিণত করতে হবে। আদিবাসী, দলিত, ঋষি, ধাঙ্গর, বুনোসহ বহিঃস্থিত (Excluded), জনগণ যাতে কোন ধরনের দরিদ্রতার কারণে বঞ্চিত বা শোষিত না হয় তার উদ্যোগ নিতে হবে।

৮.২। আদিবাসী অধিকার প্রসঙ্গেঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। ভূমি কমিশনের কার্যক্রম শুরু করতে হবে। আদিবাসীদের নিজস্ব পরিচয় বহন করার সাংবিধানিক অধিকার স্বীকৃতি দিতে হবে। সমতলের আদিবাসী ভূমি সমস্যার সমাধানে পৃথক ভূমি কমিশন করতে

হবে। সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক বাজেট বরাদ্দ করতে হবে। সমতলের আদিবাসীদের বিষয়গুলো পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ন্যায় একটি বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হতে হবে।

৯। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিতে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জাতিসত্ত্বার বিকাশ নিশ্চিত করণ।

৯.১। মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে অর্জিত এই দেশের শত শত বছরের সংস্কৃতি বাহক সকল বর্ণ, ধর্ম, গোত্র ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, আদিবাসি বিভিন্ন ভাষাভাষি মানুষের সকল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পক্ষপাত দুষ্টহীনভাবে রক্ষা ও লালন করতে হবে।

৯.২। মুক্তিযুদ্ধের মূলনীতির উপর দাঁড়িয়ে ঐ সকল জনগোষ্ঠীর সাহিত্য, শিল্প, ভাষা, চারু ও কারুকলা, সঙ্গীত, নাটক, জারি গান, সারি গান, লোক গান, চলচ্চিত্র, লোক ঐতিহ্য, মেলা, যাত্রা গান, লাঠি খেলা সকল ধর্মের জাতীয় উৎসব পালনের সকল বাধা দূর করে জাতীয় সংস্কৃতির ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। ‘বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য’ এর নীতিকে প্রাধান্য দিতে হবে।

৯.৩। সকল ধর্মের জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতা সাংবিধানিকভাবে নিশ্চিত করা, বিশেষ কোন ধর্মের আগ্রাসন, অন্যের ধর্মে অধিকার হরণ, বাধা প্রদান কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদকে চিরতরে নির্মূল করতে হবে।

৯.৪ ।ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগণের ধর্ম পালনে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ আইন বাস্তবায়নসহ মামলা জট দূরীকরণ ও দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে।

৯.৫। বাংলাদেশের আত্মপরিচয় তুলে ধরতে এই জনগোষ্ঠির অতীত ইতিহাসসহ বর্তমান জাদুঘরের স্মৃতিতে ধরে রাখা, জাতীয় জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সহ প্রত্মতাত্তিক সকল নিদর্শন রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা নিরাপদ ও রক্ষাণাবেক্ষণ করতে হবে।

৯.৬। সাংবিধানিকভাবে সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় রাজনীতির নামে কোন রাজনৈতিক দল গড়তে না দেওয়া এবং আইনের আওতায় তা নিষিদ্ধ করতে হবে।

৯.৭। মুক্ত বুদ্ধির চর্চা, ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবোধ, বিজ্ঞানমনস্ক চেতনা যেমন রক্ষা করতে হবে তেমনি সকল প্রকার কুপমণ্ডুকতা, কুসংস্কার কঠোর হস্তে দমন করতে হবে।

১০। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মানব সম্পদের উন্নয়ন ও সার্বিক ক্রীড়া ব্যবস্থাপনা

১০.১। জাতীয় শিক্ষা নীতির সকল অসংগতি দূর করে তাকে পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করা, শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা, শিক্ষাকে জাতীয়করণ করাসহ বিজ্ঞানভিত্তিক একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন সহ সকল পর্যায়ের মাদ্রাসা শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা নীতির অধিনস্ত করতে হবে। উচ্চ শিক্ষাকে আধুনিকায়ন ও গবেষণাসমৃদ্ধ করার পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে জিডিপি'র ৬ শতাংশ বাজেট নির্ধারণ করতে হবে।

১০.২। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বায়ত্ত্বশাসন নিশ্চিত করা। শিক্ষকদের পর্যাপ্ত বেতন-ভাতা ও মর্যাদা নিশ্চিত করা, তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবিসমূহ কার্যকর করতে হবে। কোচিং বাণিজ্য বন্ধের আইন কার্যকর করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক পাঠদানকে নিশ্চিত করতে হবে।

১০.৩। সামাজিক সাংস্কৃতিক পশ্চাদপদতা দূর করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলা যাতে জনগণের মধ্যে মানবতাবোধ দেশপ্রেম গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ, অন্যায়-অবিচার শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণা, জাগরিত ও প্রসারিত করা যায়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বিকশিত করাসহ শিক্ষা কারিকুলামে অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে উর্ধে তুলে ধরতে হবে।

১০.৪। জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার জন্য বাজেটে অগ্রাধিকার প্রদান করা, দেশ ও দেশের বাইরে কর্মসংস্থানের উপযোগী বৃত্তিমূলক শিক্ষা, প্রায়োগিক শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা-কার্যক্রম গ্রহণ করা, প্রতিটি উপজেলা পর্যায়ে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও আত্মকর্মসংস্থান এবং বিদেশে চাকুরী ব্যয় নির্বাহের জন্য স্বল্প সুদের ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০.৫। একটি সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে তার সকল ঐতিহ্যবাহী

খেলাধুলাকে জাতীয় সংস্কৃতির অধীন করে তা বিকশিত করে তুলতে হবে। প্রতিটি জাতীয় আন্তর্জাতিক খেলাধুলাকে পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দিতে হবে। জঙ্গিবাদ ও মাদকের ছোবল থেকে তরুণ-তরুণীদের রক্ষা করতে বেশি বেশি করে শিশু বয়স থেকেই খেলাধুলার প্রতি আকৃষ্ট করাসহ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলক অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। প্রতিটি বাজেটে অর্থ বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বাড়াতে হবে। ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, কাবাডী, হ্যান্ডবল, সাঁতারসহ সকল জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্নীতিমুক্ত করে প্রকৃত খেলোয়াড় ও অভিজ্ঞ নেতৃত্বের হাতে পরিচালনার ভার দিতে হবে। খেলাধুলার প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয় রাজনীতির বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বানানো চলবে না।

১১। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও আইসিটি খাত

১১.১। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা, উন্নয়ন, প্রসার এবং এর সফল প্রয়োগের মাধ্যমে দেশ ও জাতির সার্বিক আর্থসামাজিক সমৃদ্ধি অর্জনে তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ উল্লেখযোগ্যভাবে গড়ে তুলতে হবে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, বেতন-ভাতা, চালান এবং সকল প্রকার প্রদেয় ফিসহ জনগণের সাথে সরকারি পর্যায়ের দপ্তরসমূহের আর্থিক লেনদেনে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতি চালু করতে হবে।

১১.২। রপ্তানি বরাদ্দ ও ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে দেশের প্রতিভাবন তরুণ ও আগ্রহী উদ্যোক্তাদের সর্বোতভাবে সহায়তা দিয়ে সফটওয়্যার শিল্প ও আইটি সার্ভিসের বিকাশ সাধন করতে হবে। বিভিন্ন বিভাগ ও পুরনো জেলা শহরে আইটেক পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, আইসিটি ইনকুবেটর কার্যক্রম পূর্ণোদ্যমে চালু করতে হবে। সারাদেশে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা প্রদানের জন্য ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক স্থাপনের প্রকল্প হাতে নিতে হবে

১১.৩। তথ্য-প্রযুক্তি খাতের সর্বোত্তম বিকাশ এবং দেশি-বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির ব্যবস্থা সম্বলিত উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

১২। স্বাস্থ্য-চিকিৎসা নীতি পরিবার কল্যাণ ও প্রজনন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

১২.১। সকল নাগরিকের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার নীতিই হবে আমাদের

লক্ষ্য। মৌলিক সাংবিধানিক অধিকার সুনিশ্চিত করতে সকল নাগরিকের জন্য বিনামূল্যে মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে হবে।

১২.২। নগর ও গ্রামের স্বাস্থ্যসেবার বৈষম্য দূরীকরণসহ শহরের প্রতিটি ওয়ার্ড ও গ্রামের প্রতিটি ইউনিয়নে প্রাথমিকভাবে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন, সাধারণ সরকারি হাসপাতালের সুবিধা সেবা বৃদ্ধি করাসহ ইউনিয়ন, আয়ুর্বেদ ও হেমিওপ্যাথি বায়োকেমিক সহ নানান ট্রাডিশনাল চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রযুক্তিগত সুবিধা প্রসারিত করতে হবে।

১২.৩। জনসংখ্যার সংখ্যানুপাতে চিকিৎসা ব্যবস্থার মান উন্নয়ন, দক্ষ মানবশক্তি গড়ে তোলা, মেডিক্যাল টেকনোলজি, নার্সিংসেবা শিক্ষার সম্প্রসারণ করা হবে ও ইউনিয়ন, নগরের ওয়ার্ড ভিত্তিতে টেলিমেডিসিন ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।

১২.৪। ছোট ও পরিকল্পিত পরিবার গঠনের বিষয়টিকে স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষায় পরিণত করা, জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাদির ব্যবহার জনপ্রিয় ও সহজলভ্য করা। এসব প্রয়াসের মাধ্যমে ১০ বছরের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসতে হবে।

১৩। নির্বাচন কমিশন, নির্বাচনী ব্যবস্থা ওজনগণের সংসদ

১৩.১। আমাদের দেশের জনগণের দীর্ঘ লড়াইয়ের দাবি হচ্ছে একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশন ও স্বাধীন নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, নির্বাচন কমিশনকে আরো পূর্ণ ক্ষমতাসহ শক্তিশালী করতে হবে।

১৩.২। সংবিধানের অধীনস্থ হয়েই প্রতি টার্মে সুনির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন সম্পন্নসহ সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে।

১৩.৩। টাকার খেলা, ব্যয়বহুল নির্বাচন, পেশী শক্তির ব্যবহার, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত নির্বাচনী ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সহ সংসদে রাজনৈতিক দলসমূহের প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩.৪। ’৭২ এর সংবিধানে ঘোষিত রাষ্ট্রীয় ৪ মূলনীতির উপর দাঁড়িয়ে

সংবিধানে বর্ণিত সকল বিধি, উপবিধিকে কার্যকর করতে আইন রচনা ও বাস্তবায়ন করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৪। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আইনের শাসন

১৪.১.১। সর্বস্তরে আইনের শাসন সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিচার বিভাগকে ঢেলে সাজানো, উপনিবেশিক আইনী কাঠামো সংস্কার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও মর্যাদা সুনিশ্চিত করাসহ সকল স্তরের দুর্নীতি বন্ধ ও আইনজীবীদের গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। গ্রাম আদালতথেকে শুরু করে দেশের সর্বচ্চ আদালত ও আইনী ব্যবস্থা জনগণের হাতের নাগালে থাকতে হবে।

১৪.১.২। স্বাধীন মানবাধিকার কমিশনকে আরো গতিশীল, দায়িত্বশীল ও শক্তিশালী করে তুলতে হবে।

১৪.২। ক্ষমতার গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় সরকার ও প্রশাসন

১৪.২.১। স্থানীয় সরকার উন্নয়ন ও গণতন্ত্র চর্চার কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে বিবেচিত হতে হবে। বাজেট সরাসরি স্থানীয় সরকারের জন্য বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

১৪.২.২। স্থানীয় সরকার আইন সংস্কার করে নির্বাচিত নারী ও অন্য নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিকার ও নির্বাচনী এলাকার সমতা আনতে হবে।

১৪.২.৩। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায়, মেয়র, চেয়ারম্যান ইত্যাদি পদে পরোক্ষ অর্থাৎ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা নির্বাচন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে আইন সংস্কার করতে হবে।

১৪.২.৪। তৃণমূলে জনতার ক্ষমতা– এই গণতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে প্রশাসনিক পর্যায়ে সরকারি প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ করে ঐ সকল কাঠামোতে জনগণের অভিগম্যতা সহজতর করতে হবে।

১৪.২.৫। স্বশাসিত, আর্থিক সক্ষমতাসহ স্থানীয় সম্পদের উপর পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব এবং স্থানীয় জনগণের কাছে দায়বদ্ধ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা ও আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে স্থানীয় সরকার মুক্ত রাখতে হবে।

১৫। মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ

১৫.১.১। মহান মুক্তিযুদ্ধে ও স্বাধীনতার সংগ্রামে দেশের জন্য যারা লড়াই করেছেন জীবন আত্মাহুতি দিয়েছেন সেই সকল বীর সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের যথার্থ সম্মান, তাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতাসহ সকল মুক্তিযোদ্ধাদের বার্ধক্যকালীন ভরণ পোষণ চিকিৎসা ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করা হবে। মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের চাকরি-কোটা ব্যবস্থা নির্দিষ্ট থাকবে। মুক্তিযোদ্ধারা দেশের 'সম্মানিত নাগরিক' হিসেবে রেল, বাস, লঞ্চে বিনামূল্যে ভ্রমণ সুবিধা ভোগ করবেন।

১৫.১.২। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও গৌরব রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে সর্বক্ষেত্রে উর্ধেতুলে ধরতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের সকল স্মৃতি সংরক্ষণে যেমন-গণকবর, বধ্যভূমি, যুদ্ধক্ষেত্র ইত্যাদি সকল জায়গায় স্মৃতিস্তম্ভ , সৌধ, ভাস্কর্য নির্মাণ করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক জেলায় জেলায় মিউজিয়াম পাঠাগার গড়ে তুলতে হবে।

১৫.১.৩। শিক্ষা পাঠক্রমে বাধ্যতামূলক মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, দেশের স্বাধীনতার উদ্দেশ্য ওআদর্শ যুক্ত করতে হবে।

১৫.২। যুদ্ধাপরাধীর বিচার ও সাম্প্রদায়িকতা জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ অব্যাহত রাখা

১৫.২.১। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে। সংবিধানে বর্ণিত চার মূলনীতি সহ ধর্মনিরপেক্ষতার মূলনীতির ভিত্তিতে দেশে যেকোন সাম্প্রদায়িক উস্কানী কঠোরভাবে দমনে প্রয়োজনে বিশেষ আইন প্রণয়ন করতে হবে।

১৫.২.২। সংবিধানের ১২ বিধির (ক) (খ) (গ) (ঘ) বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখতে হবে।

১৬। নারী অধিকার, ক্ষমতায়ন ওজেন্ডার সমতা

১৬.১.১। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকার সনদ, ১৯৭৯ সালে ঘোষিত নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ তথা 'সিডো

সনদ’ (কোনো রকম সংরক্ষণ ছাড়াই), ১৯৯৩ সালে ঘোষিত ভিয়েনা সম্মেলন এবং ১৯৯৫ সালে বিশ্ব নারী সম্মেলনে ঘোষিত বেইজিং কর্মসূচি পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

১৬.১.২। যৌতুক প্রথা, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, অপহরণসহ সকল প্রকার নারী নির্যাতন কার্যকরভাবে রোধ করা, নারী ও শিশু পাচার রোধ করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা, কন্যা শিশুদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে প্রশাসনসহ সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

১৬.১.৩। ‘পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ আইন’ প্রণয়ন করা, ‘ক্রিমিনাল প্রসিডিউর কোড’ এবং ‘অ্যাভিডেন্স অ্যাক্ট’-এ নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক ধারাসমূহ শনাক্ত ও দূর করা। ‘অভিভাবক ও পোষ্য আইন ১৮৯০’ সংশোধন করে অভিভাবক ও পোষ্য গ্রহণের বিধানে সমতা আনা, ‘ইকুয়াল অপরচুনিটি অ্যাক্ট’ প্রণয়ন করা এবং এসব ছাড়াও বর্তমানে প্রচলিত আইনে যেসব পিতৃতান্ত্রিক বিধান রয়েছে তার অবসান ঘটানো, বিদ্যমান পারিবারিক আইন ও উত্তরাধিকার আইনের ক্ষেত্রে যে বৈষম্য বিরাজ করছে তা দূর করা এবং ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড চালু করতে হবে।

১৬.১.৪। ২০০৮ সালে ঘোষিত নারী উন্নয়ন নীতিমালাকে আরো বিকশিত করা এবং তার পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৬.১.৫। জাতীয় সংসদসহ সকল জনপ্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠানে নারীদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ ও ঐ সকল আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

১৬.২। শিশু-কিশোর-যুব ও বৃদ্ধ-দুঃস্থ, প্রতিবন্ধী নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা

১৬.২.১। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়ন করা, শিশু শ্রম বন্ধ করার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলা, শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে স্বাধীন কমিশন গঠন করতে হবে।

১৬.২.২। বঞ্চিত শিশুদের জন্য বৃত্তিমূলক ও কারিগরী শিক্ষা প্রদানের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১৬.২.৩। পথশিশুদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা বলয় নিশ্চিত করাসহ ছিন্নমূল পথশিশুদের জন্য রাত্রিকালীন নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১৬.২.৪। শিশুদের সৃষ্টিশীল বিনোদনের জন্য উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ ও কাঠামো গড়ে তোলা, শহরের পার্ক, খেলার মাঠ পুনরুদ্ধার করে সংরক্ষণ করা, সরকার ও ব্যক্তিমালিকানাধীন আবাসিক এলাকা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সকল এলাকায় যেন শিশুদের খেলার মাঠ থাকে, সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৬.২.৫। দেশের গ্রাম ও শহরের অসহায় বৃদ্ধ নাগরিকদের জন্য পেনশন, বয়স্ক ভাতা, দুঃস্থ ভাতা, আবাসন কেন্দ্র, সেনিটোরিয়াম সুবিধা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা, লিঙ্গ ভেদে সকল বয়সের প্রতিবন্ধী নাগরিকদের সামাজিক অধিকার ও সুবিধাসহ রাষ্ট্রীয় ভাতার ব্যবস্থা করা, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের সকল সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

১৬.২.৬। বন্যা, উত্তরাঞ্চলের মঙ্গা ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জলাবদ্ধতা এবং নদীভাঙ্গনের শিকার অসহায় মানুষসহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়গ্রস্থ মানুষদের জন্য জরুরি ভিত্তিতে খাদ্য ওকাজের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৬.৩।যুব শক্তি ওযুব সমাজ

১৬.৩.১। কর্মক্ষম সকল যুবকদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার জন্য সুনির্দিষ্টভাবে বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

১৬.৩.২। সংবিধান বর্ণিত মৌলিক অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারণ করা, কর্মবিহীন বেকার যুবকদের কর্মহীন সময়ে বেকার ভাতা প্রদান করতে হবে।

১৬.৩.৩। যুব সমাজকে ধ্বংসকারী মাদকাসক্তি ও মাদক ব্যবসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া, যুব সমাজকে ‘সামাজিক পুঁজি’ ও ‘মানব সম্পদ’ বিবেচনায় তাদের শ্রম, মেধাকে কাজে লাগিয়ে সামনে এগিয়ে নিতে হবে।

১৭। দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়ন-সন্ত্রাস প্রতিরোধ ও উন্নত আইন শৃংখলা ব্যবস্থাপনা

১৭.১। ধনবৈষম্য-প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে ও সামাজিক ন্যাযতার প্রশ্নে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স দেখানো হবে। দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর আইন,

প্রয়োগ সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে। দুর্নীতি দমন কমিশনকে প্রভাবমুক্ত রেখে স্বাধীন সক্ষমতায় দাড় করানো হবে। ঘুষ, কালোটাকা, পাচারকৃত টাকা, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ঋণখেলাপী, পেশী শক্তি, মাস্তানী প্রতিরোধ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রতিটি নাগরিকের আয়-রোজগার ধনসম্পদ সম্পর্কে সমাজে একটি জবাবদিহি মূলক ব্যবস্থা থাকবে।

১৭.২। জনবান্ধব আইনশৃংখলা বাহিনী

চলাফেরায় ভয়-সন্ত্রাস মুক্ত পরিবেশ, জনগণের জানমালের নিরাপত্তা, সামাজিক শৃংখলা রক্ষায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নির্ভর একটি জনবান্ধব পুলিশী ব্যবস্থাসহ উন্নত আইনশৃংখলা ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে। দলীয় রাজনীতির বাইরে আইনের শাসন কার্যকর করার লক্ষে ঐ বাহিনী কাজ করবে। পুলিশসহ বিভিন্ন আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতিটি সদস্যের জীবনমান উন্নয়নে তাদের পরিবারের কল্যাণে রেশন, ভাতা, চিকিৎসা, শিক্ষা, আবাসনসহ সকল রকমের মানবিক সুবিধাদি প্রদান করা হবে। পুলিশ প্রশাসনকে জনকল্যাণমূখী করে উপনিবেশিক ধারা থেকে বের করে পূর্ণ সংস্কার করতে হবে।

১৭.৩। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ওবাধাহীন তথ্যপ্রবাহ

১৭.৩.১। সকল প্রকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ ও অবাধ তথ্য প্রবাহের নীতি অব্যাহত রাখা, তথ্য অধিকার আইনের সর্বোচ্চ প্রয়োগ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

১৭.৩.২। তথ্য কমিশনকে প্রতি মুহূর্তে যুগোপযোগি করে তোলা সহ তথ্য কমিশনে জনগণের অধিকার সমুন্নত রাখতে হবে।

১৭.৩.৩। তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লবের ফলে সামাজিক গণমাধ্যম, ব্যক্তিগত তথ্যপ্রবাহ যেমন বেড়েছে তেমনি সামাজিক গণমাধ্যমের অপব্যবহারও বেড়েছে। উভয় দিক বিবেচনা করে একটি গণতান্ত্রিক উন্নয়নমুখী নীতিমালা তৈরি করতে হবে।

১৭.৩.৪। সংবাদপত্রকে একটি শিল্প হিসেবে ঘোষণা সহ প্রয়োজনে প্রনোদনা দেওয়া হবে। কমিউনিটি রেডিও ধারণাকে বাস্তবায়ন করে

গ্রামীণ উন্নয়নে তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করা হবে। সাংবাদিকদের প্রয়োজনীয় সুবিধাদি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

১৮। জলবায়ু পরিবর্তন : নদী, পানি সম্পদ ও পানি ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ, বনাঞ্চল, হাওড়-বাওড় বিল সংরক্ষণ

১৮.১.১। উন্নত পুঁজিবাদী বিশ্বের ও সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির সীমাহীন মুনাফার মনোবৃত্তি বিশ্বজুড়ে কার্বন এমিশন বাড়িয়ে চলেছে। যার পরিণতি 'জলবায়ু পরিবর্তন' সংঘটিত হচ্ছে। আর এর অভিঘাত সব দেশে পড়লেও গরিব দেশগুলোর উপর নেতিবাচক প্রভাব মারাত্মক হয়ে উঠেছে, সেই কারণে বৈশ্বিক জলাবায়ু পরিবর্তনের হুমকি মোকাবেলায় জাতিসংঘের উদ্যোগে গৃহীত প্যারিস চুক্তি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং স্থানীয় জ্ঞান ওলাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

১৮.১.২। পরিবেশ আইনের কার্যকর প্রয়োগ এবং পানি, মাটি ও বায়ু দূষণের সাথে জড়িত সকল ব্যক্তি, শিল্প-প্রতিষ্ঠান, কল-কারখানার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

১৮.১.৩। বন উজাড়, পাহাড় কাটা, নদী ভরাটকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেয়া। সংশ্লিষ্ট দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও পরিবেশ ধ্বংসকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৮.১.৪। বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবনসহ বনাঞ্চল সংরক্ষণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, বৃক্ষহীন বনাঞ্চলের পুনর্বাসন করা, সামাজিক বনায়ন কর্মসূচিকে জোরদার করা সহ দেশজ ফলজ বৃক্ষ, বনজ বৃক্ষ বাড়াতে হবে ও ক্ষতিকর বিদেশী গাছ নিধন করতে হবে।

১৮.১.৫। ভৈরব কপোতাক্ষ নদের পলি অপসারণ এবং ভবদহ সমস্যা সমাধান, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জলাবদ্ধতা নিরসনে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৮.১.৬। বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষা ও কর্ণফুলীসহ গুরুত্বপূর্ণ নদনদীর নাব্যতা বজায় রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা। শহরের পার্ক, খেলার মাঠ, খাল, পুকুর ও শহরের উন্মুক্ত স্থানগুলো সংরক্ষণ ওপুনরুদ্ধার করতে হবে।

১৮.১.৭। এই দেশের নদীগুলোর নাব্যতার উপর দেশের উর্বরতা, পরিবেশগত ভারসাম্য ও সামগ্রিক অর্থনীতির মেরুদণ্ড দাঁড়িয়ে আছে। এদেশের ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও এর সঙ্গে সংযুক্ত। পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, সুরমা, তিস্তা, করতোয়াসহ সকল আন্তঃদেশীয় নদীগুলোর নাব্যতা বজায় রাখার লক্ষ্যে সকল প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে। জাতীয় স্বার্থকে অক্ষুণ্ন রেখে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর মধ্যে উজানে বাঁধ নির্মাণ বন্ধের দাবিসহ আন্তর্জাতিক নদী আইনের ভিত্তিতে অববাহিকা ভিত্তিক নদী ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে ও আন্তঃদেশীয় যৌথ চুক্তি করার কূটনৈতিক উদ্যোগ বাড়িয়ে তুলতে হবে।

১৮.২। সামাজিক সুরক্ষা: হাওড়-বাওড় চরাঞ্চল উপকূলীয় অঞ্চল, নদী ভাঙ্গন, চা শ্রমিক, হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষার নীতি বস্তবায়ন

১৮.২.১। সংখ্যাগরিষ্ঠ হত দরিদ্র জনগণ হাওড়-বাওড়, চরাঞ্চল, উপকূলীয় অঞ্চল বাস করেন, এছাড়াও শহরের ভাসমান বস্তিবাসী, নদী ভাঙ্গনের শিকার মানুষ, পশ্চাৎপদ চা শ্রমিক নানাভাবে দেশের উন্নয়নে, উৎপাদনে ভূমিকা রাখলেও তারা প্রতিমুহূর্তে মানবিক বিপর্যয়ের শিকার হচ্ছেন। বাংলাদেশের ফসল, ভূমি ব্যবস্থাপনার ও ইনফরমাল সেক্টরের কাজের বৈচিত্রময়তাকে খেয়ালে নিয়ে ঐ সকল জনগোষ্ঠীকে পরিপূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তার অধীনে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়ে আসতে হবে। ঐ সকল এলাকার উন্নয়নের জন্য বিশেষ দফতর, উপ-দফতর পরিদপ্তর গঠন করে জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

১৮.৩। অভিবাসী শ্রমিক স্বার্থ, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রবাসী কল্যাণ দক্ষ ব্যবস্থাপনা নীতি বাস্তবায়ন

১৮.৩.১। বাংলাদেশের প্রায় ১ কোটি শ্রমজীবি নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত মানুষ দেশের বাইরে কর্মরত আছেন। তাদের আইনী সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। তাদের বিরাট অংশ দেশে রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছেন। এই অভিবাসি শ্রমিকদের সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় সুযোগ সৃষ্টি সহ তাদের পাঠানো অর্থের উপরে দাঁড়িয়ে শিল্প কলকারখানা গড়ে তোলা এবং অংশিদারিত্ব নিশ্চিতকরণ করতে হবে।

১৮.৩.২। আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের প্রতিযোগিতায় অভিবাসি শ্রমিক তৈরির ক্ষেত্রে তাদের প্রশিক্ষণ সহ মানব সম্পদ বিবেচনায় সকল রকমের

সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

১৮.৩.৩। জনশক্তি মন্ত্রণালয়, বেসরকারি জনশক্তি প্রতিষ্ঠান সমূহের দালালি দুর্নীতি বন্ধ সহ সরাসরি জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে বিদেশ পাঠানো স্বল্পমূল্যে সহজ সরল পদ্ধতি নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে ঢেলে সাজাতে হবে।

১৮.৪। দারিদ্র্য বিমোচন ও সমবায় নীতিমালার কৌশল বাস্তবায়ন

দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে সমবায় আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সংবিধান অনুসারে দেশের সর্বত্র সমবায় আন্দোলনকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করতে হবে। বিশেষ করে ক্ষুদ্র শিল্প, ইনফরমাল সেক্টর ও কৃষি ক্ষেত্রে সমবায় ব্যবস্থাপনাকে দৃঢ়ভাবে গড়ে তুলতে হবে। এ লক্ষ্যে সমবায় দপ্তরগুলোকে অধিকতর সক্রিয় ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনার উপযোগী করা ওদুর্নীতি বন্ধ করতে হবে।

১৯। জাতীয় প্রতিরক্ষা নীতি

১৯.১.১। দেশের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব এবং অখন্ডতা রক্ষায় সশস্ত্র বাহিনীকে যেমন শক্তিশালী রাখতে হবে, তেমনি দেশের সকল নাগরিককে বহিঃশত্রুর আক্রমণ মোকাবেলায় জাতীয় সামরিক প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে।

১৯.১.২। সামরিক বাহিনীকে জনগণের মিত্র বাহিনী হিসাবে ভাবদর্শগতভাবে মতাদর্শগতভাবে প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দ্বারা সমৃদ্ধ করতে হবে।

১৯.১.৩। তিন বাহিনী (স্থল, নৌ, বিমান) পরিপূর্ণভাবে সমন্বিত করে আধুনিক দক্ষ প্রশিক্ষিত বাহিনী হিসেবে প্রতিনিয়ত যুগোপযোগি করতে হবে।

১৯.১.৪।প্রতিরক্ষা বাহিনী অবশ্যই সংবিধানের অধীনস্থ হয়ে কাজ করবে। বাহিনীর নিজস্ব শৃঙ্খলা, প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনাসহ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের পেশাগত সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে হবে।

১৯.২। জাতীয় পররাষ্ট্র নীতি

‘স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করা সহ কেউ কারো অভ্যন্তরীণ

ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না'– এই নীতির ভিত্তিতে এবং পারস্পরিক সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও সমমর্যাদার ভিত্তিতে সকল দেশের সংগে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টা নিতে হবে।

সাম্রাজ্যবাদ, নয়া-উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ, আধিপত্যবাদ, নব্য নাৎসি আগ্রাসন ও ইহুদিবাদের বিরোধিতা করা এবং দুনিয়ার সর্বত্র জনগণের মুক্তির সংগ্রামের পক্ষে দাঁড়ানো পররাষ্ট্রনীতির মূল বিষয়বস্তু হবে। প্যালেস্টাইন সহ আরব জনগণের মুক্তি সংগ্রাম ও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে আফ্রিকার জনগণের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সক্রিয় সমর্থন ও সাধ্যানুযায়ী সর্বপ্রকার সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

বিশ্বশান্তি ও নিরস্ত্রিকরণের স্বপক্ষে, সর্বপ্রকার যুদ্ধ উন্মাদনার বিরুদ্ধে ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। সকল প্রকার বৈদেশিক সামরিক ঘাঁটি বিলুপ্তির স্বপক্ষে বিশ্ব জনমত গড়ে তোলা এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে দৃঢ় ভূমিকা রাখতে হবে।

২০। জাতীয় গণতান্ত্রিক উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন

২০.১.১। শিল্প, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও জনসম্পদ উন্নয়নে জাতীয় নীতিমালার ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ নিয়ন্ত্রিত সংস্থা বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি ইত্যাদি সংস্থার ব্যবস্থাপত্রের বদলে জনপ্রতিনিধি ও জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনগণের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা নির্ভর জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

২০.১.২। উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করাসহ ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির কাজকে অগ্রাধিকার দিয়ে দেশের শিল্প, বাণিজ্য, প্রযুক্তি ইত্যাদি নীতি প্রণয়ন করতে হবে। বিশ্ববাজারের অসম প্রতিযোগিতার মুখে জাতীয় শিল্প-কারখানার স্বার্থ রক্ষায় রাষ্ট্রীয়ভাবে সহায়তা প্রদানের নীতি অনুসরণ করতে হবে।

২০.১.৩। ঢালাও বিরাষ্ট্রীয়করণ, বিনিয়ন্ত্রণ, উদারীকরণের আত্মঘাতী নীতি পরিত্যাগ করা। রাষ্ট্রীয় কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে দক্ষ, উন্নত ও লাভজনক করার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা। একই সঙ্গে ব্যক্তিখাতে প্রকৃত উদ্যোক্তাদের শিল্প-ব্যবসার পথে প্রতিবন্ধকতা দূর করা এবং রাষ্ট্র কর্তৃক

তাদের সহায়তা প্রদান করা। উৎপাদন ও সেবামূলক খাত বিকাশের স্বার্থে ব্যক্তি, সংহতি-সমবায় ও অন্যান্য মিশ্র খাতকে সহায়তা প্রদান করা। প্রবাসীদের অর্জিত আয়-উপার্জনকে দেশে বিনিয়োগ করার জন্য প্রণোদনামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২০.১.৪। মাথাভারী প্রশাসনসহ সকল অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বরাদ্দ যুক্তিসঙ্গত পরিমাণে হ্রাস করা, জাতীয়ভাবে দক্ষতার সঙ্গে উৎপাদিত হচ্ছে বা উৎপাদন করা সম্ভব এ ধরনের পণ্য উৎপাদনের সুরক্ষা দেয়া, বিলাসদ্রব্যের আমদানি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

২০.১.৫। পরিবেশ-প্রতিবেশ রক্ষা করে পর্যটনকে শিল্পখাতে রূপান্তরিতসহ বিশ্বমানের পর্যটন ব্যবস্থাপনার সঙ্গে নিজেদের সক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

২০.১.৬। এনজিও কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছ জবাবদিহিতার জায়গা আরো জোরদার করতে হবে। এনজিওর মাধ্যমে টাকা পাচার, দুর্নীতি, বন্ধসহ জঙ্গি তৎপরতা, ধর্মীয় জঙ্গিবাদের পৃষ্টপোষক সহযোগী কর্মতৎপরতা শক্ত হাতে দমন করতে হবে। দুর্নীতিগ্রস্ত ও জঙ্গিবাদের সহযোগী এনজিওদের লাইসেন্স বাতিল করতে হবে।

২০.১.৭।দেশের বিত্তবানদের জন্য কর রেয়াত প্রদান বন্ধ করে তাদের ওপর প্রত্যক্ষ করের হার বৃদ্ধি ও বাজেটে সাধারণ জনগণের ওপর আরোপিত পরোক্ষ করের অনুপাত হ্রাস করতে হবে।

২০.১.৮। জাতীয় উন্নয়নের প্রশ্নে সকল প্রকার স্বার্থ নিশ্চিত করে সকল পর্যায়ে আঞ্চলিক উপআঞ্চলিক অর্থনৈতিক ফোরাম এর সংগে থাকতে হবে। সেক্ষেত্রে আসিয়ান রিজিওনাল ফোরাম (এআরএফ) এশিয়া কো অপারেশন ডায়ালগ (এসিডি) এশিয়া ইউরোপ মিটিং (আসেম) সার্ক, বিমসটেক, ডি-৮ ইত্যাদি ফোরামগুলিকে উদ্যোগী করতে হবে। বিসিআইএম (বাংলাদেশ-চায়না-ইন্ডিয়া-মিয়ানমার) ইকোনমিক করিডোরের উদ্যোগ সমূহ সক্রিয় থাকতে হবে।

২১। জাতীয় অর্থনীতি স্বার্থ ও সমুদ্র ব্যবস্থাপনা

২১.১। বঙ্গোপসাগরে মায়ানমারের সংগে সমুদ্রসীমা ভাগাভাগির পর একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। সমগ্র সমুদ্রসীমায় বাংলাদেশের

সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ‘নীল অর্থনীতি’ (ব্লু ইকোনমি) খ্যাত ঐ অঞ্চল থেকে ব্যাপক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সংগঠিত করা সম্ভব ও সেই লক্ষ্যে সমুদ্র অঞ্চল সুরক্ষা সহ সামুদ্রিক সম্পদ, মৎস সম্পদ আহরণ ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে দক্ষ জনবল, সমুদ্র বিজ্ঞান গবেষণাগার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সহ, সমুদ্রসীমা রক্ষায় নিরাপত্তা বলয় গড়ে তুলতে হবে। নীল অর্থনীতিকে জাতীয় উন্নয়নে কাজে লাগাতে হবে।

২১.২। জাতীয় সম্পদ ও স্বার্থ রক্ষায় দেশজ উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়ন ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন প্রতিরোধ

২১.২.১। লুটেরা পুজিবাদী অর্থনীতি, লুটেরা শাসক গোষ্ঠী, ব্যক্তি গোষ্ঠীগত স্বার্থে দেশীয় খনিজ সম্পদ সহ জাতীয় সম্পদ বেনিয়া সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর

হাতে তুলে দিতে চায়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরও লোলুপ দৃষ্টি রয়েছে। যে কোন মূল্যে এই প্রবণতা রুখতে হবে। তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ বন্দর ইত্যাদি জাতীয় সম্পদগুলি দেশীয় পরিকল্পনায় জনস্বার্থে ব্যবহারের কৌশল নীতিমালায় জনগণের ইচ্ছাকেই প্রতিফলিত করতে হবে। রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র সুন্দরবন হেরিটেজ এলাকা থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে করতে হবে। জাতীয় তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষায় আন্দোলনকে আরো এগিয়ে নিতে হবে।

ওয়ার্কার্স পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি। ওয়ার্কার্স পার্টি শ্রমিক, কৃষক, শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থের পার্টি। ওয়ার্কার্স পার্টি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দেশপ্রেমিক পার্টি। ওয়ার্কার্স পার্টি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী পার্টি। ওয়ার্কার্স পার্টি অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন পার্টি। সর্বোপরি ওয়ার্কার্স পার্টির আছে সুনির্দিষ্ট, আদর্শভিত্তিক ও বাস্তবমুখী কর্মসূচি । আসুন, শ্রমিক-কৃষকসহ জনগণের নিজস্ব দাবির আন্দোলনের ভিত্তিতে বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে ২১ দফার ভিত্তিতে সামাজিক ন্যায্যতা-সমতা প্রতিষ্ঠাসহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক জনগণতান্ত্রিক আধুনিক বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

নোটস

কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক ৩১/এফ, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত
ই-মেইলঃ wpartybd@bangla.net

মূল্যঃ ১০ টাকা